গোলাপের জন্য ভালবাসা

আরে ধ্যাৎ, আবার ট্রাফিক জ্যাম। জনকণ্ঠের বিশাল ভবন থেকে বেরিয়েই বিপত্তি। লম্বা লাইন। তিন মিনিটে তিন হাত এগুতে পারলাম। এই সেরেছে! বেলা পড়ে এলো। শীতের দিনের বেলা দেখতে দেখতে চলে যাবে। রোদের তেমন তেজ আর নেই। তবে পাশের দু'টো টেম্পো খর খর কড় কড় কটাকট কটাকট ফটাস ফটাস আওয়াজ তুলছে অনেকক্ষণ ধরে। হরেক রকমের আওয়াজ তুলছে এগুলো। মনে হলো যে, লোহার ছন্দে ওদের জীবন ধারণ, সেগুলো নানা বর্ণ ও গোত্রের। একদেশি হলে পাঁচমিশালি আওয়াজ তোলার কথা নয়।

একবার ছাত্র জীবনে কাপ্তাই পেপার মিল দেখতে গিয়েছিলাম। দেখতে দেখতে এমন এক জায়গায় পৌঁছলাম যেখানে কান-ফাটানো শব্দ, অল্পতেই টেকা দায় হয়ে দাঁড়ালো। বাঁশ পড়ছে ঘটাং ঘটাং, গনগনে আগুন জ্বলছে ফোঁস ফোঁস। কান বাঁচান এবং জান বাঁচান জরুরি। তৎক্ষণাৎ কানে আঙুল দিয়ে সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিলাম।

ভাবলাম, আরো গোটা দুই টেম্পো জড়ো হলে আজকে কাপ্তাই কাগজ কলের বয়লার এদের কাছে নস্যি হয়ে যাবে। এরা ঢাকার রাস্তার দস্যি ছেলে। ভাল ভাল, নিজের কাব্য প্রতিভায় নিজেই হাসলাম। গাড়ির কাচ তুলে দিয়ে সামনে আর একবার উঁকি ঝুঁকি মারলাম। না, নট নড়ন চড়ন। আজকে বোধ হয় কপালে ভোগ আছে। ভোগ ! আরে না, সে ভোগ নয়। এখানে কোন দেবতা নেই, রাজ্য নেই, রাজা নেই, কাজেই রাজভোগও নেই। তবে আছে নন্দিত রাজপথ, আবেগ এবং হতাশা মিশানো দুর্ভোগ।

গোঁদের উপর বিষফোঁড়া—কথাটা মন্দ নয়। এখানেও পেলাম। একটা স্কুটার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষণে ক্ষণে বেজায় ধোঁয়া ছাড়ছে। চোখ জ্বালাপোড়া করতে লাগলো। রুমাল বের করে একবার চোখের পানি নাকের পানি মুছলাম। জানালার সামান্য ফাঁকও বন্ধ করতে বাধ্য হলাম।

আজকে সাথে আছে ভাগ্নে, গাড়ি চালাচ্ছে ধৈর্যের সাথে। ও আমার অনুরোধের ড্রাইভার। ছোট খাট দু'একটা লেখালেখির কাজে আসলে ওর জিপটা ধার করি। সে আমার মতো নব্য লেখক নিয়ে চলাফেরা করতে আনন্দ পায়। মনে হয় কিছুটা গর্বিতও হয়। আমার দিকে তাকিয়ে ছিলো এতক্ষণ। স্টিয়ারিং-এ সামান্য তবলার মতো শব্দ করতে করতে বললো—মামা, দরজাটা কিন্তু বন্ধ করেছ নিজেই। পুনরায় ওটা বন্ধের জন্য দাপাদাপি করতে থাকলে বিপদ। হ্যান্ডেলটা তোমার উপদ্রব সইতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে।

বিপদটা কী ধরনের? বলে বাইরে তাকিয়ে ধোঁয়ার আলামত বোঝার চেষ্টা করতেই বিপদ। সত্যি সত্যি কাচের দেয়ালে নাকের ঠোকাঠুকি। চশমাটা কোন রকমের বাঁচলো বটে তবে ব্যথাটা তীব্র হয়ে ছড়িয়ে পড়লো সারা মুখে। আবার চোখ নাক মুছতে হলো উহ্ আহ্ করতে করতে।

ভাগ্নের গম্ভীর মুখে মনে হলো হাসির চিলতে রেখা ফুটে উঠলো। বললো—মামা, তুমি প্রায়ই অক্স ফাইট দেখ নাকি?

কেন রে? তখনও চোখের নাকের পানিতে নাকানি চুবানি খাচ্ছি। অক্স ফাইট কী? বলে চশমাটা খুলে ডান হাতে নিয়ে ওর দিকে ফিরলাম। না খুলে উপায়ই বা কি? চোখের জলে চশমা নষ্ট, মুছতে হবে যে।

ভাগ্নের দৃষ্টি এখন আমার দিকে নেই। মনে হলো উঁকি দিয়ে সিগন্যালের লাল নীল বাতি দেখার চেষ্টা করছে। মনে মনে ভাবলাম—আজকের বাতিগুলি নষ্ট। সামনের দৃষ্টি রেখেই ভাগ্নে বললো—মামা, কাচের সাথে তোমরা নাসিকার ঘর্ষণ দর্শনীয় ছিলো। অক্স ফাইটের মতো আর কি। তা এমনকি বাইরে আছে যে নাসিকা ঘর্ষণের সাথে দর্শন করতে হবে ?

আমি ছোটখাট মানুষ, ডান পা অর্ধেক সিটের উপর তুলে ভাল করে ফিরলাম ভাগ্নের দিকে। ব্যথাটা ইতিমধ্যেই সামলে উঠেছি। ওর কথা গায় মাখলাম না। মাখি কী করে? ওর অক্স ফাইটের ব্যাপারে উৎসুক হয়ে উঠেছি যে।

—তোর অক্স ফাইট কিরে? রাস্তায় তো রিক্সা আর টেম্পোর ঠাসাঠাসি, তা ছাড়া তো আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। বলে উত্তরের অপেক্ষায় ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ষাঁড়ের গুঁতোগুঁতি দেখনি মামা? তুমি কি টেলিভিশন দেখা ছেড়ে দিয়েছো? সাবের এখনও সামনের দিকে তাকিয়ে।

ওর দৃষ্টি আমার দিকে না ফিরিয়ে বললো—আরে, মনে হচ্ছে অবাক হচ্ছ ! অবাক হবার কিছুই নেই। অক্স ফাইটে অক্সের ধারালো শিঙের গুঁতোয় হৃদয় ফুটো হয়। তবে মামা, একটা জবর হাসি দিলো সাবের। বললো—তোমার ডেমোনেসস্ট্রেশনও খারাপ ছিলো না। বলে আবার দুলে দুলে হাসতে লাগলো সে।

—তোর কি দিব্যদৃষ্টি আছে? সামনে তাকিয়ে দিব্যি আশপাশের খবর রাখছিস? সাথে সাথে মনে হয় আমার শিংও আবিষ্কার করে ফেলেছিস, নাকি সত্যি শিং গজিয়েছে? বলে মাথায় হাত দিয়ে শিংয়ের অস্তিত্ব অনুভব করার চেষ্টা করলাম। তারপর সাবেরের দিকে তাকিয়ে মর্মাহত ভঙ্গিতে বললাম—যে ফাইট-ই দিই, চোখ জ্বালা-করা ধোঁয়া এখনও আসছে। গাড়ির ভেন্টিলেটর বন্ধ করে দিই?

মামা, সাবের আবার হাসছে। বললো—অক্স ফাইটে মানুষ মরলে বীর খেতাবে ভূষিত হয়। তবে গাড়ির মধ্যে অক্সিজেনের অভাবে মরলে না আবার মহাবীর হয়ে যায়!

চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম—ঢাকার রাস্তার এই আপদ আর ট্রাফিক জ্যামের বিপদ লেগে থাকলে বলা যায় না। একদিন মহাবীর হিসাবে বিখ্যাত হয়েও যেতে পারি।

এরই মধ্যে সামনে হাত পাঁচেক জায়গা খালি হলো। মনে হলো পুরো রাস্তাটাই কিসের টানে যেন দুলে উঠেছে। যেন প্রাণ পেয়ে হাঁটা শুরু করেছেন গজেন্দ্র মহারাজ। সামান্য গড়িয়ে গড়িয়ে চললো গাড়িগুলো। তারপর আবার গ্যাট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। দু'টো রিকসা হঠাৎ এসে এমন ভাবে সেধিয়ে গেলো যে আমাদের পথ নাই হয়ে গেলো মুহূর্তে। আরো একটা রিকসা এর ফাঁক দিয়ে ফাঁকতালে ঢোকার চেষ্টা করলো। না পেরে মুখ কালো করে এদিকে সেদিক তাকাতে থাকলো হালকা পাতলা চালক। সম্ভবত অন্য কোন ফাঁক ফোকর খুঁজছে। তারপর একটা অকথ্য ভাষায় খিস্তি আউড়ে ক্ষান্ত দিলো এগিয়ে যাবার চেষ্টা। ট্যাক খুঁজে একটা বিড়ি বের করে আস্তে আস্তে ডান হাতের বৃদ্ধ এবং তর্জনীর মধ্যে নাড়াচাড়া করলো খানিকক্ষণ। বুক পকেট হাতড়ালো অলস ভঙ্গিতে। সম্ভবত লাইটার বা দিয়াশলাই খুঁজছে। না পেয়ে কপাল কুঁচকে বিড়িটা বাম পকেটে রেখে লুঙ্গি তুলে নির্বিকার মুখ মুছতে শুরু করলো। বেচারা খেয়াল করছে না, ক্ষণিকের জন্য হলেও ঢাকার মহাসড়কে সবার সামনে লজ্জাহীন হয়ে পড়েছে সে।

হঠাৎ টুক টুক আওয়াজে বাম দিকে ঘাড় ঘুরালাম। সাবধানে নামালাম কাচের দেয়াল। ছ'সাত বছরের একটা বাচ্চা ছেলে গোটা পাঁচেক গোলাপ হাতে দাঁড়িয়ে। বললো স্যার, এই পাঁচটা কেনেন, বিশ টেহা দেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনুনয় করতে লাগলো ছেলেটা।

ওর দিকে ভাল করে তাকালাম। চুলগুলো উস্কোখুস্কো। রাঙা মেম সাহেবদের মতো লাগছে দেখতে। পুরো শরীরে পুরু ময়লার স্তর। গায়ের রঙ কালো। ঢাকার রাস্তার ধুলার বরকতে একটা এক্সট্রা জৌলুস বেড়েছে ওর চুলের, বুঝতে কোন কষ্ট হলো না। ছেলেটা হাত বাড়িয়ে ফুলগুলো দিতে গেলো আমার কাছে। যে সাইজের সে তাতে দরজা পেরিয়ে গাড়ির ড্যাশ বোর্ড অবধি তার হাত পৌঁছল না। খেয়াল করলাম, ফুলগুলো নেতিয়ে পড়েছে।

বললাম—সোনামণি, আমার যে আজকে ফুল লাগবে না।

না লাগে লাগুক—তয় আমারে এটটা টেহা দিয়া জান, মাঝে মধ্যে তো আপনে আমারে দেন, মনে নাই?

ছেলেটার ছোট অথচ স্পষ্ট উচ্চারণের কথাগুলো ভাল লাগলো। একটু নিচু হলাম তাকে দেখতে। মনে করতে পারলাম না মুখটা। কতো ছেলেই তো দেখি। তবু পকেট হাতড়ে এক টাকার একটা কয়েন পেয়ে হাতে তুলে দিলাম। সাথে সাথে বললাম—বাপজান, তুমি ফুলগুলোরে একটু স্নান করাও, পানি পাইলে এগুলো একটু তাজা হবে।

পাশের এক টেম্পোতে দশজন আরোহীর মধ্যে একজন তরুণী অন্যদের সাথে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে। নির্বিকার আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হলো আকাশ দেখাই ওর কাজ, নাকি পরিবেশের জঞ্জাল থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার প্রাণান্ত চেষ্টা। তার বিপরীতে বসা ভদ্রলোক শ্মশ্রুমণ্ডিত। সম্ভবত আমার কথা শুনতে পেয়েছে। আমার সাথে চোখাচোখি হতেই হাসলো সামান্য।

আরো কয়েকটা বাচ্চা ছেলে ফুল নিয়ে ছোটাছুটি করছে। দেখতে এবং ভাবতে ভালই লাগলো। ভিক্ষার পরিবর্তে ফুলের ব্যবসা। ভালই তো। প্রশংসার দাবি রাখে শিশুগুলো। এতক্ষণে ট্রাফিক জ্যামের কারণ উপলব্ধি করতে পারলাম। যাক, এই ফাঁকে ওদের দু'টো পয়সা আয় হোক।

দেখলাম একটা বাচ্চা গোটা পাঁচেক ফুলের একটা গোছা নিয়ে উৎফুল্ল হয়ে ছুটছে। একটা রিকশা আছড়ে পাছড়ে পার হলো ছেলেটা। পরের রিকসায় যখন সে পৌঁছল দেখতে পেলাম একটা সুন্দর হাত ১০ টাকা বাড়িয়ে ফুলগুলো নিলো। ক্রেতাকে দেখতে সামনে সামান্য ঝুঁকলাম বাঁয়ে।

রিকসা আলো করে বসে আছে দুই সুন্দরী ষোড়শী। ফুলগুলো দু'জনার মাঝখানে রেখে দু'জনেই হাসছে। দূর থেকে অনুভব করছি ওদের হাসি আর প্রাণের পরশ। ওদের দৃষ্টিতে বিস্ময় আর ভালবাসা। ভাল করে দেখতে আরও একটু ঝুঁকলাম। ভাবছি, অন্য কেউ না দেখলেও হয় তো সাবের কোন একটা কমেন্ট করবে। ও যা মুখ পাতলা। তবে এখন আমি সব ভয়ের উর্ধ্বে। যা অর্থ করে করুক, আমি ঘাড়টা আরও একটু বাড়িয়ে দিলাম। এ মন কাড়া দৃশ্য দ্বিতীয়বার আর হয় তো দেখার সৌভাগ্য না ও হতে পারে।

দেখলাম ওদের একজন আদর করে ফুলের একটা পাপড়ি ছুঁল, আবার সাথে সাথে হাতটা সরিয়ে নিলো। যেন মূল্যবান কোন মানিক্য, সামান্য ছোঁয়াতে জৌলুস হারাবে। কিংবা, কোন জাদুর কাঠি ছুলেই পাথর হয়ে যাবে দুয়োরানীর অভিশাপে।

যার হাতে ফুল সে আবার ফুলগুলো নাকের কাছাকাছি আনলো। আমার মনে হলো, এখান থেকেও আমি তাজা ফুলের গন্ধ পাচ্ছি। গুন গুন করে আমার মন বলে গেয়ে উঠলো-

তুমি গোলাপ খানি নেবে?
বুকের ভিতর ফোটাচ্ছি আজ গোলাপ বনের
ফুলগুলি সব, হাতে আমার
নির্বাচিত একটি গোলাপ,
সুগন্ধে তার থমকে আছে ব্যস্ত শহর
গাছ ও পাখি, স্বপ্নে আঁকা সাজানো ঘর,
তুমি গোলাপ খানি নেবে ?
আমি এখন গোলাপ বনের
ফুল ও কাঁটার খেলায় মুখর
দুপুর রোদে ঘাম ঝরিয়ে
নীল গোলাপের আবাদ করি,
স্বপ্নে আমার অন্যরকম পৃথিবী আজ
দোষণমুক্ত এই শহর
জ্যোৎস্নাভরা পূর্ণিমা চাঁদ আঁকা
তবু আমি একা একা গোলাপ হাতে--

কি মামা, হারিয়ে গেল নাকি? ভাগ্নের উৎসুক কণ্ঠ আমাকে বাস্তবে নিয়ে এলো।

দিলি তো সব মাটি করে! আবার তাড়াতাড়ি ফিরে তাকালাম দুই ষোড়শীর দিকে।

কবিতায় পেয়েছে? ভাগ্নের হাসি হাসি মুখ

বুঝলি কী করে? আমি অবাক। কিন্তু দৃষ্টি ফিরালাম না।

কারটা মারলে?

কবিতা সবার। সৃষ্টির আনন্দে কেউ মেতেছে। তাই বলে এটা একান্তই তাঁর নয়। ভাগ্নেকে উদ্দেশ্য করে বললাম—আনন্দটা মাটি করিস না।

আমার আঙুল আবার নেচে উঠলো।

দেখলাম তরুণী দু'জনে আনন্দভরা বিস্ময়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে এখনো। আবার দু'জনের মাঝামাঝি রাখলো ফুলগুলি। মনে মনে ভাবলাম নাম কিগো তোমাদের, মেয়েরা! ফুলের মতো সুন্দর বলেই কি তোমরা এতো ভালবাসো ফুলকে।

ওদের সৌন্দর্য উপভোগ ও বন্টনের সুন্দর ব্যবস্থা, কোন রাগারাগি বা হানাহানি নেই। নেই উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, তপ্ত কোন বাক্য বিনিময়। আছে শুধু ফুলের জন্য একরাশ নিঃস্বার্থ ভালবাসা।

আস্তে আস্তে আবার গড়াতে শুরু করলো গাড়ির চাকা। আড়াল হয়ে গেলো ওদের রিকসাটা। না, না ! ঐ তো আবার দেখা যাচ্ছে। আর ঘাড় ঘুরিয়ে বসা সম্ভব না, তা হলে হয়তো আমার পুরো ঘাড় চিরকালের জন্য উল্টো হয়ে যাবে। যে ফুল আর তার প্রতি ভালবাসা দেখতে মন এতো ব্যাকুল, তারা আড়ালে চলে গেলো! আহা, আবার যদি একটু দেখা যেতো!

হ্যাঁ হ্যাঁ ঐতো, আবার দেখা যাচ্ছে! ধ্যানমগ্ন বকের মতো ওরা তাকিয়ে আছে ফুলের দিকে। মনে হলো ঐ ফুলের একটা পাপড়িও ঝরে পড়লে ওরা গলা ছেড়ে কাঁদবে। হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়বে রাস্তায়, পাপড়িটাকে উদ্ধার করতে। আহা, ওরাও যদি হঠাৎ একরাশ গোলাপ হয়ে যেতো! যদি ভরে উঠতো এই জীবন গোলাপের ভালবাসায়।

আহা! পৃথিবীটা যদি গোলাপের ভালবাসা আর সুঘ্রাণে ভরে উঠতো একদিন!